পশ্চিমবঙ্গের দেগঙ্গার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার

*

একটি মানবাধিকার প্রতিবেদন

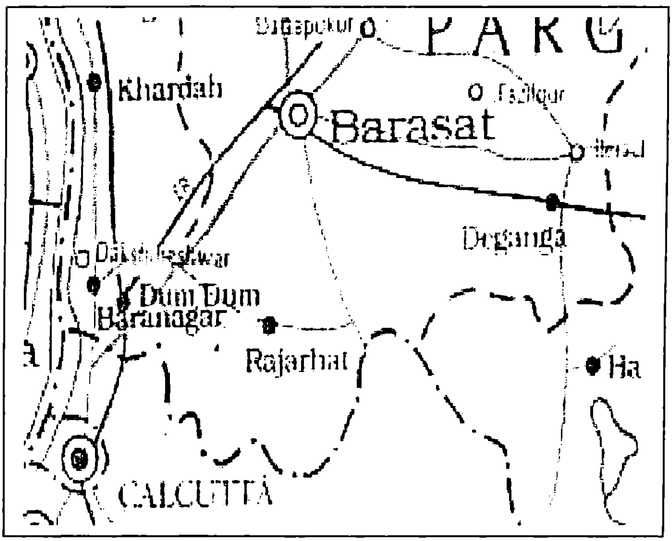
CAAMB

December 2010

পশ্চিমবঙ্গের দেগঙ্গার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার - একটি মানবাধিকার প্রতিবেদন

কেন ক্যাম্বের এই দেগঙ্গা রিপোর্ট

৬-৭-৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দেগঙ্গা অঞ্চলে তিন দিন ধরে দফায় দফায় দাঙ্গা চলে। ৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে '*পুড়ল ৫০টি বাড়ি ও দোকান। ... ৩০০টি দোকান ও বাড়িতে চলল ভাঙচুর।*' সেনাও নামান হল। ৯ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার শিরোনাম *'সেনা টহলের মধ্যেই লুঠ দেগঙ্গায়'।* এরপর থেকে চলল নীরবতা। কারা আক্রান্ত হলেন? কাদের বাড়ি-দোকান পুড়ল? না, কোন পত্রিকাতেই এ নিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না। এতবড় ঘটনা, মিলিটারি নামলো, কলকাতার এত



কাছে -- না -- কোন বিদ্বজ্জন / বুদ্ধিজীবি, আগুনঝরানো মানবাধিকার নেতা / এনজিও একটি শব্দও করেননি। এমনকি টিভি-মিডিয়া যারা খবরের অভাবে প্রায় বাড়ির ভাইয়ে ভাইয়ে পারিবারিক ঝগড়ারও লাইভ কভারেজ করে তারাও কলকাতার এত কাছের সার সার ভাঙা বাড়ি পোড়া দোকানের বা আক্রান্তদের কোন ছবিই দেখাতে সাহস করলেন না। প্রায় একমাস পর ৫ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে যে ক্ষতিগ্রস্ত *১৬৭টি পরিবারের হাতে ১ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য তুলে দিল সরকার।*

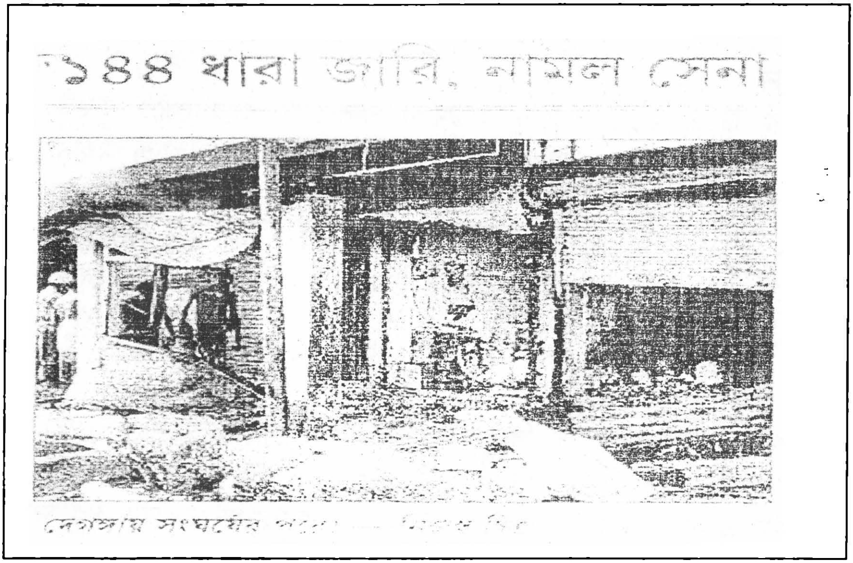
কোটি টাকা! কারা পেলেন এত টাকা? না, তাও কাগজ জানায় নি। কেন এই নীরবতা? **কারণ ক্ষতিগ্রস্তরা সবাই হিন্দু। আক্রমণকারীরা সবাই মুসলমান।**

তিন দিন ধরে চলেছে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণ, লুট, আগুন লাগানো, মন্দির ভাঙ্গা। পুলিস, র‍্যাফ কেউ সক্ষম হয়নি সেই জেহাদীদের রুখতে। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। শেষ পর্যন্ত নামাতে হয়েছে মিলিটারি। দেগঙ্গা অঞ্চলের ৩১টি দুর্গাপূজা কমিটি এবার পূজা করল না। পূজা হুজুকের পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পূজা হচ্ছে না (বাংলাদেশে যা আকছার হয়) এতবড় একটা খবর কোন বাংলা কাগজ তা ছাপাল না, ছাপাল একমাত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। আর এই সব কিছু ঘটেছে রাজধানী কলকাতা থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে দেগঙ্গায়। 'মানবাধিকার'-এর ধ্বজাধারী সংগঠনদেরও কোন সাড়াশব্দ নেই -- যেন কোথাও কিছু হয়নি। পরিবর্তনপন্থী বিদ্বজ্জনেরা মুখে কুলুপ এটেছেন। তখন **'ক্যাম্ব'কে** এগিয়ে আসতে হল মূল ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করতে।

ক্যাম্ব (Campaign Against Atrocities on Minorities in Bangladesh) বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আহমেদিয়া-আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য একটি প্রচার আন্দোলন। কিন্তু ক্যাম্ব দেগঙ্গার ঘটনায় এ জন্যই যুক্ত হয় কারণ দেগঙ্গার অত্যাচারিত হিন্দুরা মূলতঃ পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে ইসলামি অত্যাচারে পালিয়ে-আসা হিন্দু জনগোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে যে নিরুপদ্রব জীবনের স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন তা আজ ভেঙে গেছে। এ এক ধরণের পরিহাসও বলা যেতে পারে যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-আহমেদিয়া-আদিবাসী) ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এক দশক আগে যে সংগঠন তৈরী হয়েছিল তাকে আজ স্বদেশে সংখ্যাগুরুর ওপর ইসলামী অত্যাচারের তদন্ত রিপোর্ট তৈরী করতে হচ্ছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে দেগঙ্গা ব্লকে হিন্দুরা নিতান্ত সংখ্যালঘু, ১৯৯১-র জনগণনায় মাত্র ৩০%। এই আক্রমণের ধরণ পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ঘটনা বলেই মনে হতে পারে।

এবার পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘু অঞ্চলের আগামীদিনের অশনি সংকেত কি দেগঙ্গার ধ্বংসলীলা?


১৪৪ ধারা জারি, নামল সেনা

<u>এই প্রতিবেদনের তথ্যসূত্র</u>

৯ সেপ্টেম্বর, আক্রমণ শেষের পরের দিন, ক্যাম্বের দুই সদস্যের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে, ছবি তোলে। এর পর ১৫ সেপ্টেম্বর ***অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের*** একটি দল ও ২৬ সেপ্টেম্বর **ডঃ বি আর আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল**-এর একটি দল দেগঙ্গা অঞ্চলে বিস্তৃত অনুসন্ধান করে ও দুটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত করে। ***বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের*** সভাপতি ও **গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস ডিফেন্স (হল্যান্ড)**-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ সেই সময় ভারতে ছিলেন ও ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি বিভিন্ন ঘটনাস্থল পরিদর্শন, পুলিশ আধিকারিক ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন ও ২১ সেপ্টেম্বর তা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনকে পাঠিয়ে দেন (www.bdmw.org/)। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের এবং ওয়াইকিপিডিয়াতে প্রকাশিত খবরের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে

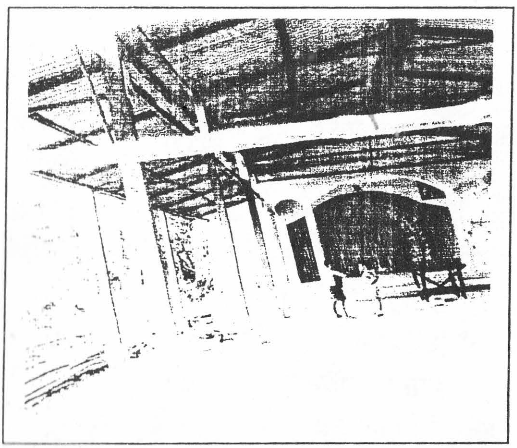
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Deganga_riots)। এছাড়া আক্রান্তদের থানায় দায়ের করা এফআইআর, দেগঙ্গা ব্লক পূজা সমন্বয় কমিটির প্রচারপত্র ইত্যাদির তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘটনার স্থান

দেগঙ্গা ব্লক উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত। কলকাতা শহর থেকে উত্তর ২৪ পরগণার সদর বারাসতের দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার, এখন কলকাতা মহানগরের উপকণ্ঠ বলেই ধরা হয়। সেখান থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে দেগঙ্গা বাজার। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল বারাসত-টাকি রোডের উপর বেলিয়াঘাটা, কার্তিকপুর ও দেগঙ্গা বাজার ও তার চারপাশের অনেক গ্রাম - দোগাছিয়া, ফলতি, দোহারিয়া, চট্টলপল্লী, খেজুরডাঙা, রামনাথপুর ও অন্যান্য।

বিতর্কিত জমি

ঘটনার শুরু জমির বিবাদকে ঘিরে। বারাসত-টাকি রোডের উপর কার্তিকপুরে বিতর্কিত জমিটি একদা ছিল রাণী রাসমণির সম্পত্তি। এই জমির সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে একটি মামলা বহুদিন ধরে কলকাতা হাইকোর্টে চলছে। এই জমির পিছনেই পঞ্চাশ বছর আগে পূর্বপাকিস্তান থেকে বিতাড়িত, চট্টগ্রাম জেলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের গ্রাম 'চট্টলপল্লী'। বর্তমানে জমির কিছু অংশে কবরখানা রয়েছে। বাকি অংশের জমির মধ্য দিয়ে এই গ্রামে যাবার পথ। চল্লিশ বছর ধরে এই জমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুর্গা পুজা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবছরের পূজার প্রস্তুতিও শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসে, বাঁশ বাঁধা হয়েছে প্যান্ডেল বানাতে। এই সময়ে জমির সীমানা বিবাদ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মিটিংও হয়ছে কয়েকবার।



ঘটনার শুরু - ৬ ই সেপ্টেম্বর, ২০১০

৬ সেপ্টেম্বর (২৬ রমজান) একদল মুসলমান জনতা বিতর্কিত জমিতে পাঁচিল তৈরীর উদ্দেশ্যে রাস্তার ধারে মাটি কাটা শুরু করে। ওখানে পাঁচিল হলে বিবাদিত জমিসংলগ্ন হিন্দু গ্রামে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হবে এই জমিতে আয়োজিত দুর্গাপূজার প্যান্ডালে যাওয়ার রাস্তা। সামনে দুর্গাপূজা, প্যান্ডাল বাঁধা শুরু হয়েছে এরকম সময়ে রাস্তা বন্ধ করে পাঁচিল তোলা শুরু করার অর্থ যে সরাসরি গন্ডগোল পাকানো তা বুঝতে অসুবিধে হয়না। স্বাভাবিক ভাবে চট্টলপল্লীর মানুষেরা এর প্রতিবাদ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় দেগঙ্গা থানার পুলিশ। এর পর পুলিশের ওপর ইট পাথর বর্ষণের মাধ্যমে হাজারখানেক মুসলমান জনতার আক্রমণ শুরু হয়। স্থানীয় লোকেরা জানান যে কাশ্মীর বা প্যালেস্তানীয় ঢং-এ পুলিশের ওপর পাথর ছোঁড়ায় সক্রিয় ভুমিকা নেয় মুসলমান মহিলা ও বালকরা। এতে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অরূপ ঘোষ মাথা ফেটে গুরুতর আহত হন। ইট খেয়ে পালায় পুলিশ। কিছু পরে পুলিশ ফিরে আসে বারাসত ও বসিরহাট থানা থেকে আরো বেশি বল নিয়ে। জেহাদী জনতা এর জন্যও তৈরী ছিল। এবারের জেহাদী আক্রমণে আহত হন পুলিশ অফিসার দিব্যেন্দু ঘোষ।। পুলিশ তখন শুন্যে গুলি চালায়। গুলি চলছে দেখে তখনকার মতন রণে ভঙ্গ দেয় মুসলমান জনতা। গুলিতে কেউ হতাহত হয় নি।



অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এ সময় বসিরহাটের **তৃণমূল সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম** আসেন এবং কিছু লোক নিয়ে প্রথমে থানায় যান। পরে কাছেই জামে মসজিদে যান ও হাইকোর্টের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সেখানে মাইক লাগান।

এর পর রমজানের শেষ হতে না হতেই সন্ধ্যায় মুসলমান জনতা বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু করে। ছোট ছোট ট্রাকে করে দোগাছিয়া, হাসিয়া ও অন্যান্য গ্রাম থেকে সশস্ত্র মুসলিম জনতা কার্তিকপুর বাজারে আক্রমণ করে। এখানে বাজারের কালি মন্দিরের মূর্তিটি উল্টে ফেলে ভেঙে দেয়। মিলন দে ও রবিন দের দোকান লুঠ করে। এখানে অন্যান্য হিন্দু দোকানেও লুঠপাট চালানো হয়। হামলা ছড়িয়ে পড়ে দেগঙ্গা ও বেলিয়াঘাটা বাজারে। লুঠ হয় লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, সুজিত ঘোষ, সুজিত মন্ডলের দোকান। দেগঙ্গা বাজারে সঞ্জয় দাসের দোকান ভাঙে, উত্তম সাহার মোবাইলের দোকান লুঠ করে, কানাই গুপ্তার বড় মুদির দোকান ভেঙে সব মাল লুঠ করে নিয়ে যায়। আনন্দবাজার পত্রিকার ৮ সেপ্টেম্বরের খবর '*উত্তেজনা কার্তিকপুর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বারাসতের বেলিয়াঘাটা ও বসিরহাটের দেগঙ্গা বাজার এলাকায়। রাস্তায় একের পর এক গাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন লাগাতে থাকে উত্তেজিত জনতা। রাস্তার পাশের দোকান ভেঙে আগুন লাগানো হয়। বাড়িবাড়ি ঢুকেও ভাঙচুর চালানো হয়। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত গন্ডগোল চলে।*' বলাই বাহুল্য এইসব আক্রমণকারীরা মুসলমান জনতা ও ক্ষতিগ্রস্তরা হিন্দু। একটি মুসলমান দোকান বা বাড়ি আক্রান্ত হয় নি।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, আক্রমণ অব্যাহত

পরদিন, মঙ্গলবার সকাল থেকে আবার শুরু হয় এই জেহাদী আক্রমণ এবং সেজন্য আবার সরাসরি অভিযুক্ত তৃণমূল সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম। ইতিমধ্যে এই জেহাদী জনতা জেনে গেছে যে অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না। পাঠকের মনে আছে যে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর তসলিমা নাসরিনের অপসারণের দাবীতে সারা দিন ধরে টিভি ক্যামেরার সামনে কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীরা সারা দিন ধরে গাড়ি দোকান ভাঙচুর লুঠপাট চালায় কিন্তু পুলিস কিছুই করেনি। আনন্দবাজার জানাচ্ছে যে '*মঙ্গলবার সকালে বসিরহাটের সাংসদ হাজী নুরুল ইসলামের*

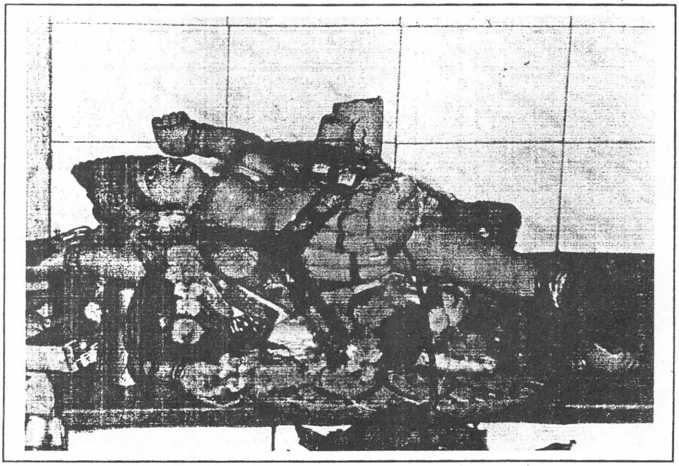
নেতৃত্বে বেশ কিছু লোক দেগঙ্গা থানায় বিক্ষোভ দেখান। তার পরেই ফের গোলমাল ছড়াতে থাকে বিভিন্ন এলাকায়।' ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারের আক্রমণ মনে হয় বেশ পরিকল্পিত ছিল কারণ আবার হামলা চালান হয় কার্তিকপুর বাজারে। মন্দিরের কালি মূর্তি সারানো হয়েছিল, আবার সেটি ভাঙা হয়, মন্দিরে প্রস্রাবও করে জেহাদীরা। প্রসাদ বসু, বিশ্বজিৎ বিশ্বাসকে আহত করে। আনন্দবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে 'বেলা তখন দেড়টা। দেগঙ্গা ঢোকার পিচ রাস্তার দু'পাশে শুধুই পোড়া দোকান, বাড়ি, গাড়ি। দমকল আগুন নেভাচ্ছিল। ...... পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের দেখতে পেয়ে কেঁদে ফেললেন অনেকে। সিদ্ধিনাথবাবুর (ডিআইজি) হাত ধরে এক বৃদ্ধ বললেন - 'দীর্ঘদিন এখানে আছি। কোনও দিনতো এমন ঘটে নি।' এই উদ্বাস্তু বৃদ্ধ এখনো ভাবেন যে পশ্চিমবঙ্গে এসে তাঁরা আর ইসলামি আক্রমণের শিকার হবেন না।

বেলিয়াঘাটা বাজারে লুঠ হয় সবচেয়ে বেশী। সেখানের ২৫ জন ক্ষতিগ্রস্তের দায়ের করা এফআইআর সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ। এখানে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি লুঠ হয়। জয়গুরু দশকর্মা ভান্ডারের মালিক সুব্রত চৌধুরির ঘরবাড়ি-দোকান সব ভাঙচুর লুঠপাট করা হয়েছে। দেবাশীষ ঘোষের বাড়ি ঢুকে টাকা গয়না টিভি সব লুঠ করে নিয়েছে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীরা। এখানে র‍্যাফের দিকে পাথর ছোড়ার সময় গুলিতে আহত হয় ও পরে হাসপাতালে মারা যায় সাহাবুদ্দিন নামে এক মুসলমান যুবক। রটিয়ে দেওয়া হয় বিকাশ (বাচ্চু) কর্মকার নাকি তার লাইসেন্স করা বন্দুক থেকে গুলি করেছে। যদিও এরকম কোন বন্দুক ঐ পরিবারের নেই। এর কারণ এই অজুহাতে বিকাশ কর্মকারের সোনার দোকান লুঠ করা হয়, বাড়িঘর ভাঙা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। এখন কর্মকার পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আক্রান্ত হন বিশ্বনাথ ঘোষের পরিবার, তাঁদের মারধর করা হয়, মেয়েদের গা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় সোনার গয়না। বেলিয়াঘাটা বাজার অঞ্চলের ৬০ জন হিন্দু ক্ষতিগ্রস্তদের নাম থানায় দেওয়া হয়েছে ও তাদের সবার নাম রবীন্দ্র ঘোষের রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে।

আক্রমণ, লুঠপাট, ঘর জ্বালানো চলে বিভিন্ন স্থানে। এভাবে খেজুরিডাঙা, আমিনপুর, ঢালিপাড়া, ফলতি, রামনাথপুর সর্বত্র চলে একই ধ্বংসলীলা।

হিন্দু ধর্মস্থান আক্রমণ

এই জেহাদী জনতার আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্মস্থান। এরা কার্তিকপুর বাজারের কালি মন্দিরটির উপর দুবার হামলা চালায়। এর জন্য হাজী নুরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ মদতের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এছাড়া স্থানীয় শিব-কালি মন্দির, কাকরা-মির্জানগরের কালি মন্দির, শনি মন্দিরেও ভাঙচুর করে। লক্ষ্যণীয় যে কয়েকদিন পর ইদ উৎসবের জন্য তৈরি কাঠ-কাপড়ের একটি তোরণেও কিন্তু কেউ হাত দেয়নি।

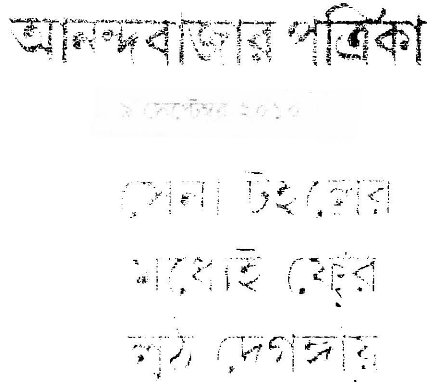


নিষ্ক্রিয় বামফ্রন্ট প্রশাসন, আক্রান্ত পুলিশও

দেগঙ্গার জেহাদী আক্রমণকারীরা কেউ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল না। ইট-পাটকেল, শাবল, তরবারি, বোমা, স্থানীয় আগ্নেয়াস্ত্র - এর বেশী কিছু নয়। এদের থামাতে সাধারণ পুলিশই যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমানে 'পরিবর্তনের' হাওয়ায়, বিশেষতঃ রমজান মাস বলে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে বামফ্রন্ট সরকার। সোমবার পুলিশ পেটানোর পর মঙ্গলবার মুসলমান জনতা আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। আনন্দবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে '*বিশাল বাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে যান ডিএসপি (ট্রাফিক) অশোক রায় ও অন্য আরেক জন ডিএসপি। সেখানে পৌছানো মাত্র দুই ডিএসপিকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারতে থাকে ক্ষিপ্ত জনতা। র‍্যাফ দুই পুলিশ কর্তাকে উদ্ধার করে। অশোকবাবুকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়েছে*'। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের জেহাদী

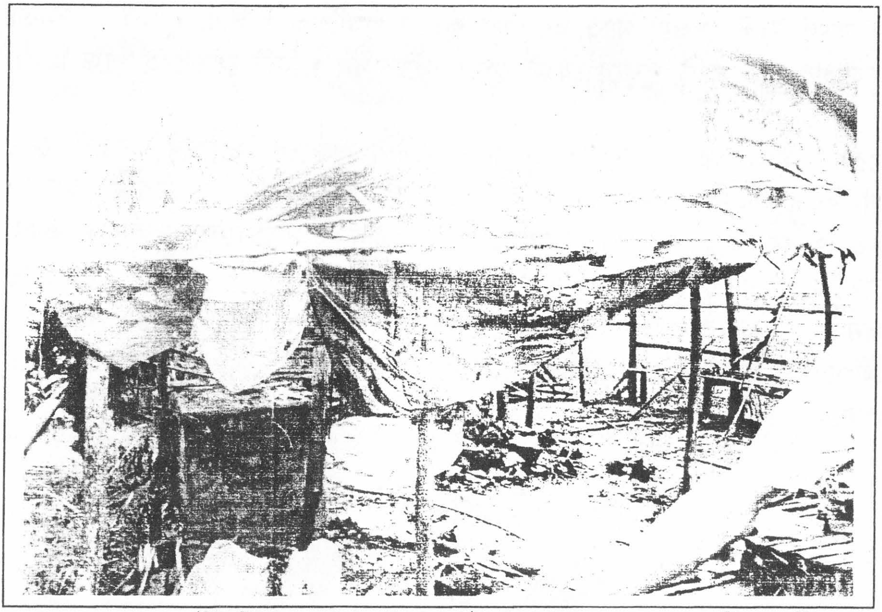
সহানুভূতিশীল প্রশাসন। এমনকি খেজুরীডাঙার হরেন বক্সীর বাড়ির সামনে পুলিসের টহল দেওয়া গাড়ি আক্রমণ করলে পুলিশেরা পালায়, মুসলমান জনতা পুলিশের সেই গাড়ি পুকুরে ফেলে দেয়। কয়েকদিন গাড়িটি সেভাবেই পড়ে ছিল।

এরপর মঙ্গলবার ৭ তারিখ দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত নেন সামরিক বাহিনী নামানোর। এই কায়দাটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' বামপন্থী কায়দা। ২০০৭-এর ২১ নভেম্বর কলকাতায় মুসলমান দাঙ্গাবাজদের বেলায়ও একই চালাকি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজ্য পুলিশ জেহাদী মুসলমান জনতাকে যেহেতু প্রত্যাঘাত করতে পারে না ফলে দায়িত্বটা কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিটারির হাতে ছেড়ে দাও, কিছু হলে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধ বামফ্রন্টের গায়ে লাগবে না।


আনন্দবাজার পত্রিকা
৯ সেপ্টেম্বর ২০১০
সেনা টহলের
মধ্যেই ফের
লুঠ দেগঙ্গায়

<u>৮ সেপ্টেম্বর - বুধবার - মিলিটারির সামনেই লুঠ</u>

সৈন্য নামলো কিন্তু তাতে গ্রামে মুসলমান জনতার লুঠপাট বন্ধ হলো না। ৯ সেপ্টেম্বর টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানাচ্ছে '*টাকি রোডে সামরিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও বুধবার সকালেও আক্রমণ চলছে*' স্থানীয় বাসিন্দা কানাই পাল টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিককে বলেছেন '*সামরিক বাহিনী ও পুলিশ রাস্তায় টহল দিচ্ছে। আক্রমণকারীরা গ্রামের ভিতরে জড়ো হয়ে তারপর এগোচ্ছে। সৈন্যরা ভিতরে না গেলে অবস্থা আয়ত্বে আনা যাবে না।*' আসলে সামরিক বাহিনীকে



স্রেফ লোক দেখাতেই নিয়ে আসা। ৯ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা লিখল '*সেনাবাহিনীর টহলদারির মধ্যেই এদিন সকালে কার্তিকপুরের খেজুরডাঙায় কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর ও লুঠের ঘটনা ঘটে। ...... রাস্তায় সেনা-পুলিশের টহলদারি থাকলেও আতঙ্ক 'কাটেনি এলাকায়।...... তার মধ্যেই এদিন দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে। দেগঙ্গা থানায় গিয়ে গ্রামবাসীরা বাড়ি ভাঙচুর, লুঠ, মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ জানান।*' স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন যে সামরিক বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল এবং চোখের সামনে এরকম অন্যায় দেখেও চুপ করে বসে থাকতে হওয়ায় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েন। কার্তিকপুর বাজারের পিছনে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আক্রান্ত হয় ও তার আশপাশে সন্টু দাস, তাপস ও অন্যান্য হিন্দুদের দোকান ভেঙে দেওয়া হয়, আক্রান্ত হয় একের পর হিন্দু বাড়ি, ভেঙে দেওয়া হয় পার্থ দাসের বাড়িতে রাখা কোয়ালিস গাড়ি। এখানে ছটি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

বুধবারের পর আর ঘটনা গড়ায় নি।

সব মিলিয়ে এই তিন দিনে এই মুসলমান জনতার আক্রমণে প্রায় কুড়িটি গ্রামের কয়েকশো পরিবার ঘরছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, তিনটি বাজারে লুঠ হলো অনেক দোকান, পোড়ান হল অনেক গাড়ি। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ অন্ততঃ ১০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার ১৬৭টি পরিবারকে মাত্র ১ কোটি টাকা সাহায্য দিয়েই দায় সেরে ফেলেছেন।



কেন এই ঘটনা, কারা ঘটালো এই জেহাদী আক্রমণ

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে মুক্তচিন্তার পরিবেশের একান্ত অভাব। ৩২ বছরের কমুনিস্ট রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজ তার নিজস্ব সংকীর্ণ ধর্মীয় আবহেই রয়েছে। পরিবর্তনের হাওয়ায় মুসলমান সমাজ এখন সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে আর তার নেতৃত্ব দিচ্ছে কয়েকজন ইমাম। কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বা ফুরফুরা শরীফের ইমাম এখন তৃণমূল দলের ইসলামি মুখ। এই ইমামরাই যখন তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে সব রকমের বেআইনী ফতোয়া জারী করেছিলেন তখন সিপিআইএম তাঁদের নীরবে সমর্থন

করেছে। এই মুসলিম শক্তি তসলিমা নাসরিনকে মেদিনীপুরে কবিতা পাঠ করতে দেয় নি, শিলিগুড়িতে বইমেলা উদ্বোধন করতে দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গের কবিকুল, বুদ্ধিজীবি (তখনও বিদ্বজ্জনেদের জন্ম হয় নি), নারী সংগঠনেরা মজা দেখেছেন। সিঙ্গুর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যর্থ অনশনের পর থমকে থাকা জমি রক্ষার কৃষক আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলল নন্দীগ্রামের আক্রমণাত্মক লড়াই। নন্দীগ্রামের আক্রমণাত্মক জমি রক্ষার আন্দোলন শুরু হয় ৩ জানুয়ারি ২০০৭-এ, জমি জরীপ করবার সরকারি দলের উপর আক্রমণ চালায় জমাতে উলেমা হিন্দের কর্মীরা। পুলিশের জীপে আগুন ধরানো হয়, রাস্তা কেটে দেওয়া হয়। এই প্রথম জমি রক্ষার জন্য হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়। একদা কংগ্রেস, বর্তমানে তৃণমুল নেতা ইদ্রিস আলির নেতৃত্বে ২১ নভেম্বর ২০০৭ সালে তসলিমা বিতাড়নের দাবীতে সারাদিন ধরে এই মুসলিম জনতার কলকাতায় হিংসাত্মক তান্ডব চালানো সব রাজনৈতিক দল নীরবে সমর্থন করেছে ও এই মৌলবাদী দাবী মেনে সিপিআইএম তাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহিষ্কার করেছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদী সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব এখন প্রতিষ্ঠিত, মাদ্রাসা শিক্ষা তাকে দিনদিন আরো জোরদার করবে। কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের



মতন একটি সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র স্থাপনের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের গতিপথ মধ্যপ্রাচ্যের পথেই। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের বোরখা পরা বাধ্যতামুলক করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদেরও বোরখা পরার ফতোয়া জারী করে মাদ্রাসা ছাত্র সংগঠন। একমাত্র শিক্ষিকা শিরিন মিদ্যা তা মানতে অস্বীকার করায় তাঁকে ক্লাস নিতে দেওয়া

হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত কোন নারী সংগঠন, প্রধান ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, রোজ টিভি-সংবাদপত্র আলো করা বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জন, 'মানবাধিকার'-এর ধ্বজাধারী সংগঠনরাও কোন আন্দোলন তো দূরের কথা এর প্রতিবাদ পর্যন্ত করে নি।

ফলে দেগঙ্গার জমি দখলের জন্য ইসলামি শক্তির একটাই সহজ পথ - গায়ের জোরে জমি দখল করা, যাতে সরকারি ও বিরোধী দুই দিকের সমর্থন পাওয়া যাবে। আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির একটি ইঙ্গিত দেগঙ্গার জেহাদী আত্মপ্রকাশ।

দেগঙ্গার ঘটনায় কোন রাজনীতি নেই, এটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় আক্রমণ। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু সমর্থক বা সিপিএমের হিন্দু সমর্থক দুজনেরই ঘরবাড়ি দোকান ভেঙেছে। ফলে ছাড় পায় নি তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য কবিতা বৈদ্যর বাড়িও। এডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে, ও ফোনে অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের প্রতিনিধিকে কবিতা বৈদ্য জানান যে তাঁর বাড়ি আক্রান্ত হয় ও মুসলমান আক্রমণকারীরা তাঁদের বাড়ির সকলের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করলে তাঁরা আক্রমণকারীদের হাত-পা ধরে কোন রকমে ছাড়া পান। তৃণমূল অঞ্চলপ্রধান শিক্ষক তারাপদ ঘোষ স্বীকার করলেন যে এটা হিন্দুদের উপর মুসলমানদের পরিকল্পিত অত্যাচার।

এই আক্রমণে বারবার অভিযোগ এসেছে তৃণমূল সাংসদ হাজী নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে, থানায় এফআইআরেও এই নাম রয়েছে। খেজুরিডাঙার অভিলাষ ঘোষের থানায় করা অভিযোগে মকলুকার রহমান, সহারাব মন্ডল সহ ৫৯ জন মুসলমানের নাম রয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায় সহ কয়েকজন তৃণমূল নেতৃবৃন্দ দেগঙ্গায় যান তখন স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের জুতো, ঝাঁটা, কালো পতাকা দেখায়। ঐ দিন ভারতীয় জনতা পার্টির একটি দলও দেগঙ্গায় যান ও পরে হাজী নুরুলের গ্রেপ্তারের দাবী জানান।

পশ্চিমবঙ্গেও দুর্গা পূজা বন্ধ হলো - *দেগঙ্গায় ৩১টি পূজা হয় নি*

প্রতিবেশী পূর্বপাকিস্তান/বাংলাদেশে পূজামন্ডপে হামলা, মূর্তি-ভাঙা খুব সাধারণ ঘটনা। এমনকি ১৯৯২ সালে ডিসেম্বর মাসে হিন্দু সমাজের উপর ব্যাপক

আক্রমণের পর তার প্রতিকারের ব্যর্থতায় ১৯৯৩ সালে সারা বাংলাদেশে কোন দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় নি। ২০১০ সালে সেই একই ঘটনা ঘটলো পশ্চিমবঙ্গেও। দেগঙ্গা ব্লকের সব ক্লাব সংগঠনগুলি মিলিত হয়ে দেগঙ্গা থানায় একটি দাবীপত্র পেশ করে। থানার আধিকারিক প্রতিশ্রুতি দেন যে তিন দিনের মধ্যেই তাঁরা পদক্ষেপ নিতে শুরু করবেন। ক্লাব সংগঠনগুলির দাবীগুলি ছিল :

'১) সমস্ত অভিযুক্ত আসামীগণকে গ্রেফতার করে যথোপযুক্ত ধারা প্রয়োগ করতে হবে।

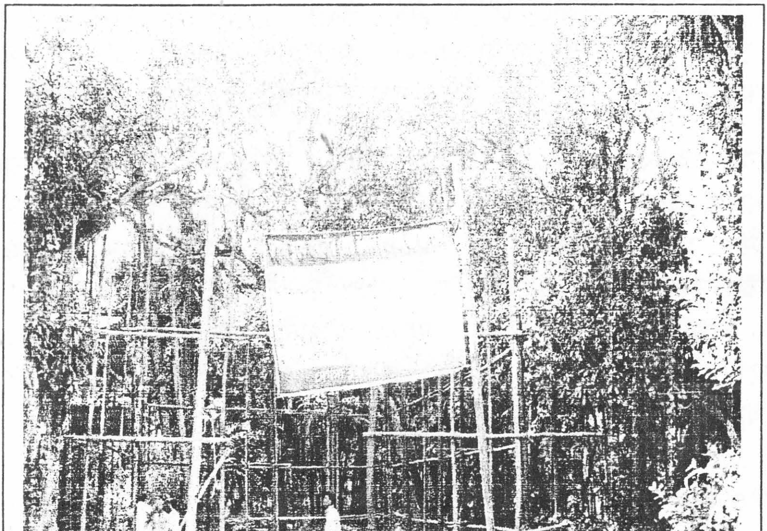
২) সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩) দেগঙ্গা মসজিদ থেকে অবিলম্বে মাইক নামাতে হবে এবং পুনরায় যাতে আর কোনদিন মাইক না তুলতে পারে সে বিষয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪) বেলেঘাটার বাচ্চু কর্মকারের উপর থেকে গুলি চালানোর মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে।

৫) চট্টলপল্লীর যাওয়া আসার জন্য ব্যবহৃত ৬০ ফুট চওড়া রাস্তা যেটি গত ৫০ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেটি কোনমতে খর্ব করা যাবে না।

৬) ৬/০৯/১০ থেকে ৮/০৯/১০ তারিখ - এই তিনদিন ধরে দেগঙ্গার বিভিন্ন



গ্রামে হিন্দুদের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে লুঠ, ভাঙচুর, মারধর, মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ ও মহিলাদের সম্ভ্রমহানির মতন ঘটনা ঘটেছে। আর পুলিশ বার বার বলছে রমজান মাস চলছে, মুসলমানদের উপর কোন লাঠি চালানোর নির্দেশ নেই। প্রশাসনকে পরিষ্কার করে জানাতে হবে যে কার নির্দেশে হামলাকারীদের উপর লাঠি পর্যন্ত চালানো বন্ধ ছিল? তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

কিন্তু আদৌ সেই প্রতিশ্রুতি না রাখায় দেগঙ্গা ব্লক পূজা সমন্বয় কমিটি এলাকার সব পূজা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বারাসত সংসদীয় কেন্দ্রের দেগঙ্গা ব্লকে যার সাংসদ তৃণমূল শ্রীমতী কাকলী ঘোষ দস্তিদারও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে অন্ততঃ ২০টি পূজা হচ্ছে না (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ১০ অক্টোবর)। শেষ পর্যন্ত ৩১টি পূজা হয় নি বলে খবর রয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হবার দিকে এক পা এগোলো। আরো আশ্চর্য পূজা-পাগল বাংলা সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলরা এই সংবাদ পরিবেশন করতে ভুলে গেল। দেগঙ্গার এই অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের পক্ষে গেরুয়াধারী কোন প্রধান হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন বা বিখ্যাত ব্রহ্মচারী-ঠাকুর-বাবাদের কোন সংস্থাও প্রতিবাদ করে নি, কোন সাহায্যও করে নি।

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বহুমাত্রিক পশ্চিমবঙ্গীয়
সমাজের ধ্বংসের এই শুরুতে
আপনারা কি নীরব থাকবেন?

একজন উদ্বাস্তুর এফ আই আর-এর অংশ

To
The Officer In Charge
Deganga Police Station
North 24 Parganas

মহাশয়,

আমি শ্রী অভিলাষ ঘোষ, পিতা - বাদল ঘোষ, গ্রাম - খেজুরডাঙা, থানা দেগঙ্গা .... মহাশয়ের নিকট কাতর প্রার্থনা বাংলাদেশ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে আমার বাবা তাঁর জন্মভিটে ছেড়ে, বুকভরা বেদনা নিয়ে, বিচার না পেয়ে ভারতবর্ষে চলে এসেছিল বলে শুনেছিলাম। আজ পুনরায় নিজ চোখে দেখলাম, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু ডাকাত ও খুনীর নেতৃত্বে আমাদের পাশেই বসবাসকারী ব্যক্তিগণ কি জঘন্যভাবে বাড়িতে ঢুকে দিবালোকে ঘরের সমস্ত মালপত্র ডাকাতি, বাড়ির মহিলাদের উদ্দেশ্যে কুমন্তব্য, অবশেষে কেরোসিন তেল ঢেলে বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দিল এবং পুনরায় খবর পেয়ে পুলিশ এসেও আমার বাড়ির থেকে ১০০ হাত দূরে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শকের মত সমস্ত ঘটনা উপভোগ করল। তারপর উক্ত হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে সমস্ত ডাকাতি করা মালপত্র নিয়ে পুলিশের সামনে দিয়ে চলে যায়। সমস্ত ঘটনাই আমি নিজে চোখে দেখেছি। এলাকা ছেড়ে সকলে চলে গেলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাদের এইভাবে সর্বনাশ করে গেল আর আপনারা একটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন না? তার উত্তরে পুলিশগণ উত্তর দিয়েছিল, আমার হাত পা বাঁধা, লাঠি পর্যন্ত চালাতে বারণ করেছে সাহেবরা। .... দোষীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমার আবেদন পত্রটি এফ আই আর হিসেবে গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

উল্লেখ থাকে যে, আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে কিছুদিন বাড়ি ছাড়া হয়েছিলাম, তারপর ভিটেতে ফিরে পোড়া বাড়ির ভিতরকার আবর্জনা পরিষ্কার ও কোনমতে বাসযোগ্য করে তুলতে অভিযোগ পত্র দিতে দেরী হল।

তাং - ২৮-০৯-২০১০

ক্যাম্ব (ক্যাম্পেন এগেইনস্ট এট্রোসিটিস অন মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশ) বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আহমেদিয়া-আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে একটি প্রচার আন্দোলন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবার পরও বাংলাদেশে চলছে ধারাবাহিক সংখ্যালঘু নির্যাতন। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে। দেশবিভাগের সময় সংখ্যালঘু হিন্দুদের জনসংখ্যা ২৮ শতাংশ থেকে এখন ৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে উদ্বাস্তু আগমন আজও চলছেই। শান্তির সময়ে এরকম নির্মম জাতি বিতাড়ন (এথনিক ক্লিনসিং) পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে উদাসীনতা ও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমগুলির এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতার জন্য সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসী এ বিষয়ে অবহিত নন। সাম্প্রতিক দু-দশকের উদ্বাস্তুরা হচ্ছেন বাংলাদেশে সাহস করে থেকে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের তফশিল জাতির মানুষেরা। এঁদের নাগরিকত্বও আজ বিপন্ন। ক্যাম্ব এই সব বিষয়ে জনমত তৈরীর জন্য একটি প্রচার আন্দোলন। ক্যাম্ব কয়েকটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ও বিভিন্ন প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ক্যাম্বের বিভিন্ন সভায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম *শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দে, শ্রীনিরপেক্ষ, কমলেশ সেন, সুনন্দ সান্যাল, মানস ঘোষ,* জেনারেল শংকর রায়চৌধুরি, *তসলিমা নাসরিন, শাহরিয়ার কবির, সালাম আজাদ, শরৎ মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, এষা দে, তথাগত রায়, কালিকৃষ্ণ গুহ, পুলকনারায়ণ ধর ও অন্যান্যরা।*

Published by CAAMB (Campaign Against Atrocities on Minorities in Bangladesh). রামঠাকুর সরণী, কলকাতা-৩২
Ph 9831085215, caambkolkata@hotmail.com